**ATMADEEP**

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
**ISSN: 2454–1508**
**Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)**
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 443- 450
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
**DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.227**

# ব্রাত্য বসুর ‘রুদ্ধসংগীত’: প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী বয়ান

**রবিউল সেখ**, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 01.10.2025; Accepted: 11.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

**Abstract**

Dr. Bratya Basu Roychowdhury's anti-establishment tone is an important aspect of his writings. His plays have come up with a direct protest against contemporary times and contemporary politics and institutions. We will see the manifestation of Bratya Basu's protest narrative in his protest narratives in plays like 'Ruddha Sangeet' and 'Winkle Twinkle'. In the 'Ruddha Sangeet' play, on the one hand, the government-institution's conflict with the artist and the artist's self-esteem has taken place side by side. Bratya Basu's anti-establishment tone against the empowerment of the ruling government has taken place in this work. This article examines Bratya Basu's protest narrative by analyzing the politics reflected in his prose, essays, interviews and other theater personalities' praise and criticism of his political plays.

**Keywords:** Anti-establishment voices, Empowerment politics, Artist struggles, Government repression, us-them politics

ব্রাত্যব্রত বসু রায়চৌধুরী— যিনি সাধারণত ব্রাত্য বসু নামেই খ্যাত। ড. ব্রাত্য বসু একাধারে নাটককার, অভিনেতা, মঞ্চ পরিচালক, চলচ্চিত্র পরিচালক, সাহিত্যিক, অধ্যাপক এবং রাজনীতিবিদ। ব্রাত্য বসু কলেজে পড়বার সময় বামপন্থী আন্দোলনের একটা আলট্রা লেফট সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেটা খুব কম সময়ের জন্য, তারপরেই সেই সংগঠন ছেড়ে দেন। ব্রাত্য বসু ছাত্র বয়স থেকে সি পি আই এম করাকে অপছন্দ করতেন। ব্রাত্য তাঁর নাটকে বামপন্থাকে সমালোচনা করলেও বামপন্থার আদর্শকে নয়। ব্রাত্যর বাবা-মা গণনাট্যের সদস্য, কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন, তবে প্রত্যক্ষ পার্টির সদস্য ছিলেন না।

নয়ের দশকে রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক থেকে একটা শূন্যতা বা সংকট তৈরি হয়। যা রাজনীতির পালাবদলের সূচনাপর্ব ধরা যেতে পারে। সাতের দশকে রাজনৈতিক পালাবদল দেখা গেছিল। তবে সেই প্রতিবাদ আন্দোলন শুধু রাজনৈতিক দলের বক্তৃতায় নয়, অনেক নাট্যদলের নাটকেও ফুটে উঠেছিল। নয়ের দশকে দেখা যায় নাট্যকর্মীরা মিডিয়ার মাধ্যমে প্রতিবাদ করলেও তাঁদের নাট্যক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। নয়ের দশকের প্রতিবাদী নাটকের শূন্যতা পূরণে ব্রাত্য বসুর রাজনৈতিক নাটকগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ব্রাত্য বসু তৃণমূল রাজনীতিতে আসেন থিয়েটার দল থেকে ব্রাত্য হয়ে। তিনি তৃণমূল সভায় গেছেন বলে থিয়েটার থেকে তাঁকে ব্রাত্য করা হয়। যে থিয়েটার দলগুলি তাঁর নাটক করত তাঁরা জানিয়ে দেন তাঁরা তার থিয়েটার করবে না। ব্রাত্যর ‘পেজ ফোর’, ‘কৃষ্ণগহ্বর’— নাটকের শো বন্ধ হয়ে যায়। চতুরঙ্গ নাটকের বিজ্ঞাপন থেকে থেকে তাঁর নাম সরিয়ে দেওয়া হয়। ব্রাত্যর নামে অভিযোগ আনা হয়, তিনি রাইটিস্ট, দক্ষিণপন্থী— তাই থিয়াটার দলগুলি তাঁর সঙ্গে থিয়েটার করতে পারবে না।

ব্রাত্য বসু রাজনীতিতে প্রবেশের আগে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। বামপন্থী রাজনীতির সমালোচক হিসেবে, তিনি পশ্চিমবঙ্গ বাম সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। নন্দীগ্রাম আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন ব্রাত্য। ২০১১-এ উত্তর চব্বিশ পরগণার দমদম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে নির্বাচিত হয়ে সিপিএম মন্ত্রী গৌতম দেবকে পরাজিত করেন। এই নির্বাচনের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিসভায় তাঁকে উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করা। ২০১৬-এর নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ের পর ব্রাত্য বসুকে পর্যটন, বিজ্ঞান প্রযুক্তি এবং বায়ো-টেকনোলজি, তথ্যপ্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক্সের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণাল্যের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের উল্লেখযোগ্য জয়ের পর, ব্রাত্য বসুকে পুনরায় শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।

ব্রাত্য বসুর লেখায় প্রতিষ্ঠান বিরোধী প্রতিবাদী স্বর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'আজকের প্রতিবাদ: গণতন্ত্রের নতুন মানচিত্র' গদ্যের একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরলে তাঁর প্রতিবাদী সত্তার একটা পরিচয় পাওয়া যাবে—

> "আমার অধিকার আছে সরকারের বিপক্ষে যাবার। আমার অধিকার আছে সরকারের বিপক্ষে কথা বলার। আমার অধিকার আছে কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে না থেকেও নিজের মতামত স্পষ্টভাবে ঘোষণা করার। একেই গণতন্ত্র বলে। আমাকে তাই শেখানো হয়েছিল। শেখানো হয়েছিল, 'তুমি আমার সঙ্গে নেই মানেই তুমি আমার বিরুদ্ধে—এই ঘোষণাকে স্বৈরাতন্ত্র বলে জানতে।"[১]

এই ন্যারেটর সত্তার প্রকাশ আমরা দেখবো তাঁর 'রুদ্ধসংগীত', 'উইঙ্কল টুইঙ্কল'-এর মতো নাটকের প্রতিবাদী বয়ান নির্মাণে। ব্রাত্য বসুর প্রতিবাদী সত্তা সম্পর্কে কবি জয় গোস্বামীর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য:

> "দেবব্রত বিশ্বাসের জীবন নিয়ে যে নাটক লিখেছেন ব্রাত্য বসু ও নতুন নাট্যদল গঠন করে তার যে প্রযোজনা করেছেন সেটি প্রবল আলোড়ন ফেলেছে দর্শকসমাজে, বাংলার খ্যাতনামা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা অনেকেই সেখানে স্বনামে উপস্থিত, চরিত্র হিসেবে এবং বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতারাও নিজ নিজ পরিচয়েই মঞ্চে এসেছেন এই নাটকে, কোনও ছদ্মবেশের আড়াল দরকার হয়নি।"[২]

প্রতিষ্ঠান কোনো মূল্যেই তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মেনে নিতে পারেন না। কংগ্রেস থেকে বামফ্রন্ট সরকার থেকে মা-মাটি-মানুষের সরকার তার ব্যতিক্রম নন। কংগ্রেসের নকশাল বিদ্রোহ দমননীতির পরই আমরা দেখবো সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম বিদ্রোহ দমনে বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিকা। আরও পরে আমরা দেখবো, জনগণের প্রতিবাদ দমনে ক্ষমতাসীন মা-মাটি-মানুষের সরকারের পুলিশের লাঠি বর্ষণ, কাদানে গ্যাসের ব্যবহার। 'রুদ্ধসংগীত' নাটককের সময়কাল ১৯৪৮ থেকে ১৯৭৯। ব্রাত্য বসুর মতে:

> "এই থিয়েটারে বলা হয়েছে ১৯৪৮ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত তিরিশ বছরের বাঙালি জীবনের গল্পকে, যেখানে বহু সত্যিকারের গুণী কৃতী বাঙালি শিল্পীর জীবন সময়ের মোহানায় একাকার হয়ে গেছে।"[৩]

রুদ্ধসংগীত নাটকে একদিকে শিল্প-শিল্পীর প্রতি সরকার-প্রতিষ্ঠানের বিরোধ, অন্যদিকে শিল্পীর আত্মমর্যাদা পাশাপাশি স্থান পেয়েছে। এই নাটকে শিল্পীর বিরোধ মূলত আমরা তিনটি দিকে দেখতে পাবো। প্রথম বিরোধ শিল্পীর সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির। দ্বিতীয় বিরোধ শিল্পীর সঙ্গে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানের। তৃতীয় বিরোধ সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে শিল্পীর। ব্রাত্য বসু এক সাক্ষাৎকারে এই নাটকটি সম্পর্কে বলেন:

> "এই নাটকটির মূল কথা হল ব্যক্তির সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক; সেটা বাঙালি সমাজে কীভাবে এসেছে। তার তুলনামূলক বিচার, অর্থাৎ শিল্পীর দিক থেকে কীভাবে, সেটা দেখা হয়নি এবং এই সূত্রে বাঙালি শিল্পীর সঙ্গে তিনটি প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। (ক) শিল্পীর সঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক, অর্থাৎ দেবব্রত বিশ্বাসের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি, ঋত্বিক ঘটকের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি বা সলীল চৌধুরীর সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি। (খ) শিল্পী এবং তাঁর নিজস্ব শিল্প সংগঠন, এবং তিনি যদি কোনো থিয়েটারের মানুষ হন, তাহলে থিয়েটারের মানুষ এবং তাঁর দল। এক্ষেত্রে দেবব্রত বিশ্বাসের সঙ্গে বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড। এবং (গ) শিল্পীর সঙ্গে গণমাধ্যমের সম্পর্ক। এক্ষেত্রে দেবব্রত বিশ্বাসের সঙ্গে সন্তোষকুমার ঘোষের সম্পর্ক।"[৪]

এই তিন বিরোধ ও শিল্পীর লড়াই, শিল্পীর আত্মমর্যাদার অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই নাটকটি অবলম্বনে দেখে নেওয়া যাক।

প্রকৃত শিল্পী তাঁর শিল্পের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের দাদাগিরির ক্রিটিসাইজ করবেন এটাই স্বাভাবিক। ব্রাত্য বসুর মতে:

> "প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক কালে যাঁরা অন্যস্বর তুলে ধরতে চেয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকের সংকট নিজের নিজের মতো করে অমোঘ থেকেছে চিরকাল। রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠান বা পার্টি তাঁদের মধ্যে সন্ত্রাস চালিয়েছে নানা কায়দায় নানান পন্থায়।"[৫]

যে-সব সৎ শিল্পীরা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে স্বর তুলে ধরেন পার্টি বা দলের কাছে তাঁরা ব্রাত্য। সমস্ত ধরনের সুবিধা থেকে তাঁদের বঞ্চিত করা হয়। এমনকি, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তাঁদেরকে কোনো সম্মাননা দেওয়া হয়না। কখনো তাঁদের নির্বাসিত করা হয়, কখনো তাঁদের লেখা ব্যাণ্ড করা হয়। তাঁদেরকে ধীরে ধীরে যন্ত্রণা দিয়ে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়া হয়। তবুও কী প্রতিষ্ঠান, সরকার, প্রকৃত আর্টিস্টের বাণী রুদ্ধ করতে পারেন? না, পারেন না। অ্যারিস্টটলকে রাষ্ট্র বিচার নামক প্রহসনের দ্বারা কালকুঠরিতে বন্দি করে হেমলক পান করিয়ে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছিলেন। তাতে অ্যারিস্টটলের বাণীকে, শিল্পকে কী রুদ্ধ করা সম্ভব হয়েছিল? অসুস্থ পাবলু নেরুদাকে চিলির সামরিক প্রধান অগুস্ত পিনোশের ভাড়াটে ডাক্তার টক্সিস ব্যাক্টেরিয়াল ইনজেকশন দিয়ে হত্যা করেছিলেন। তাতে কী পাবলু নেরুদার সাহিত্যকে রুদ্ধ করা সম্ভব হয়েছিল? বলশেভিক কবি মায়াকোভস্কিকে স্তালিনের সরকার গুলি করে মেরেছিলেন। তাতে মায়াকোভস্কির সাহিত্য রুদ্ধ করা সম্ভব হয়েছিল? রাষ্ট্রবিরোধী থিয়েটারি বক্তৃতা দেওয়ার অপরাধে মায়ারহোল্ডকে স্তালিনের রুশ পুলিশ প্রথমে গ্রেপ্তার তারপর অকথ্য নির্যাতন এবং গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধ স্বীকার করিয়ে গুলি করে হত্যা করেছিলেন। তাঁর স্ত্রীকে ফ্ল্যাটে ঢুকে কুপিয়ে হত্যা করেছিলেন। এসবেও শিল্পীর প্রতিবাদী সত্তাকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হয়েছিল?[৬] 'রুদ্ধসংগীত' নাটকটি দেবব্রত বিশ্বাসের জীবনীমূলক নাটক নয়। এই নাটকটি সম্পর্কে ব্রাত্য বসু বলেন:

> "এই বিশেষ নাটকটির মাধ্যমে কিন্তু আমি এক প্রসিদ্ধ সংগীত শিল্পীর নিছক জীবনগাথা বর্ণনা করতে চাইনি। বরং বলা যেতে পারে আমার তরফে এই নাটক যেন নিজের মতো করে গড়ে তোলা একটা যুক্তিতর্ক আর গপ্পো। যেখানে কিছু চরিত্রকে কেন্দ্র করে দেশকালের একটা বিশেষ স্থানাঙ্ক যেন জনসমক্ষে এসে গেল।"[৭]

আর সেই দেশকালের স্থানাঙ্ক ধরতে গিয়ে চলে আসে সমসাময়িক কালের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও তাঁদের সংলাপ। সর্বভারতীয় গণনাট্য সম্মিলনে পার্টি সম্পাদক অজয় ঘোষ যখন বলেন: "সংস্কৃতি-ফংস্কৃতি নিয়ে এখন আমাদের ভাববার সময় নেই।"[৮] কিংবা, পার্টির সঙ্গে ঋত্বিক ঘটকের মতান্তর হলে প্রমোদ দাশগুপ্ত এবং নিরঞ্জন ঘোষকে জ্যোতি বসু যখন বলেন: "বিষয়টা কীভাবে ট্যাকেল করবেন সেটা আপনারাই স্থির করুন। কারণ আমি আবার কালচার ফালচার ভাল বুঝি না।"[৯] 'সংস্কৃতি'-র সঙ্গে 'ফংস্কৃতি'-ই হোক কিংবা 'কালচার'-এর সঙ্গে 'ফালচার' অথবা 'নাটক'-এর সঙ্গে 'ফাটক'-ই হোক তা যে আসলে শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি সুপ্রয়োগ নয় তা বলাই বাহুল্য। তাঁদের এই বিকৃতি শব্দ প্রয়োগ এটা বুঝিয়ে দেয়, আমরা ক্ষমতাসীন, তোমরা এবং তোমাদের শিল্প আমাদের থেকে নিচে। ওসব নিয়ে ভাববার সময় আমাদের নেই। তোমরা মাইনরিটি।

সলিল চৌধুরীর কিছু গানকে পার্টি নিষিদ্ধ করেন। 'গাঁয়ের বধূ'-কে গণনাট্য সংঘে নিষিদ্ধ করা হয়। সত্যেন দত্তের 'পালকির গান'-কে প্রতিক্রিয়াশীল বলা হয়। সলীল চৌধুরীর 'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে' গানটিকে পার্টির নেতারা প্রতিবিপ্লবী আখ্যা দেন। কেন?, না, এই গানের মধ্যে আছে 'হায়, বিধি বড়ই দারুণ'। অর্থাৎ তিনি একজন কমিউনিস্ট হয়েও ঈশ্বরবাদ বা ভাগ্যবাদ প্রচার করেছেন এই গানে। তবে 'আল্লা ম্যাঘ দে পানি দে' গণনাট্যের মঞ্চে হতে পারে, কেননা সেটা প্রচলিত গান। সলিল চৌধুরীর গান বিচার করবার জন্য একটা বিচারক মণ্ডলী বসানো হয়, তাঁদের রিপোর্ট এর ভিত্তিতে তাঁর গান অনুমোদন পাবে। বলাই বাহুল্য, পার্টির আমব্রেলার আওতাভুক্ত বিচারকমণ্ডলীর রিপোর্ট পার্টির অনুগামীই হবে। সলিলের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়, সে ইনডিসিপ্লিন। সলিল চৌধুরীর পালটা জবাব:

> "আমি নাকি ইনডিসিপ্লিনড। কার ডিসিপ্লিন? পার্টির? কে পার্টি? ওই কতগুলো মুখ? দ্রুত আমার মোহ চলে যাচ্ছিল।... ওদের বোঝাতে পারি না কোটি কোটি ভারতবাসী নির্ভুল সুরে হয়তো অসাধারণ গান গায় কিন্তু মহম্মদ রফি বা লতা মঙ্গেশকর একজনই হয়।"[১০]

দল বা পার্টির বৃত্ত থেকে বেরিয়ে মৌলিক শিল্পীর শিল্প, রচনা মাত্রই ইনডিসিপ্লিন। প্রতিক্রিয়াশীল। প্রতিবিপ্লবী। রাষ্ট্রবিরোধী।

প্রতিষ্ঠান অথবা পার্টি শিল্পীর মৌলিকতাকে সমর্থন করেন না। তাঁরা মনে করেন, মৌলিক শিল্প মাত্রেরই একটা শক্তি আছে, যা শাসকদলের স্বরূপ জনগণের কাছে তুলে ধরতে পারে। এই নাটকে দেবব্রত বিশ্বাস সেই ধ্রুব সত্যকে তুলে ধরেছেন:

> "পৃথিবীর কুনোকালে কুনো দেশে ওই তোমরা যারে কও এস্টাব্লিশমেন্ট, প্রতিষ্ঠান— তা কুনোদিন একটা জিনিস সহ্য করে নাই। তা হইল অরিজিন্যালিটি— মৌলিকতা। সত্যকারের আর্টিস্টের ওই এক দুষ—তারে মানুষ ভয় পাবাই। সে তো যা চিরাচরিত, তাকে ভাইঙ্গ্যা দিতে আসছে। তারে আটকানোর চেষ্টা হইবই। একথা পরে তুমি তোমার জীবন দিয়া বুঝবা।"[১১]

এ কথা শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাস বলেছেন আর এক শিল্পী ঋত্বিক ঘটককে। ছাব্বিশ বছরের ঋত্বিক ঘটক যখন চল্লিশ বছরের দেবব্রত বিশ্বাসকে বলেন, একমাত্র তাঁদের পার্টিই (কমিউনিস্ট পার্টি) সমষ্টির অনুভবকে একত্র করে প্রকাশ করতে পারে। পার্টির প্রতি ঋত্বিকের এই ধারণাকে দেবব্রত বিশ্বাস 'উইশফুল থিঙ্ক' বলেছেন। ঋত্বিক ঘটক তাঁদের পার্টির ভালো কাজের একাধিক উদাহরণ দেন— বিড়লাদের বিরুদ্ধে ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ, বিধান রায়ের গভর্নমেন্টের করাপসন-পুলিশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। দেবব্রত বিশ্বাস তুলে ধরেন চিরন্তন সত্য, ক্ষমতা লাভের পর তাঁদের (ঋত্বিকদের) পার্টি যে জনগণের উপর স্বৈরাচারি হবেনা তার কোনো গ্যারান্টি নেই। ক্ষমতাসীন পার্টির প্রতি বিরোধী দলের প্রতিবাদ, বিরোধিতা— সবই ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবার তাগিদেই। ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবার পর তাঁদের আর কোনো প্রতিবাদ থাকেনা, তাঁদের আলাদা করে চেনাই যায়না। এ প্রসঙ্গে ব্রাত্য বসুর মন্তব্যটি গুরুত্বপূর্ণ:

> "স্বাভাবিকভাবে প্রতিবাদ দেখা যায় বিরোধীপক্ষের, বিরোধীপক্ষ ক্ষমতা দখলের রাজনীতিতে প্রকাশ্যে আসবেন বলে। ফলত প্রতিবাদ নেই, নেই কোনো প্রতিষ্ঠানবিরোধী স্বর। আছে কিছু পাবার আশায় অথবা কিছু পেয়ে গদ্গদ কিংবা নীরব সমর্থন।"[১২]

এই সত্য শিল্পী ঋত্বিক ঘটক পরে বুঝতে পারেন। যখন তাঁর বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টির কমিটি একাধিক অভিযোগ আরোপ করেন। এ প্রসঙ্গে ব্রাত্য বসুর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য:

> "সত্যিই আমাদের পিতৃসম এই মানুষগুলি, তাঁদের ব্যক্তিগত দোষগুণ সবকিছু নিয়ে একসময় বিশ্বাস করেছেন এই পার্টিই একমাত্র তাঁদের ভালোবাসবে, যত্ন করবে, তাঁদের কাজ মানুষের সামনে তুলে ধরবে। আর অচিরেই তাঁদের সেই বিশ্বাস ভেঙে গেছিল, ছুরি খেয়েছিলেন পিঠে তাঁরা সবচেয়ে বেশি। ফলে কেও তাঁরা ও পার্টিতে আর থাকতে পারেননি।"[১৩]

প্রতিষ্ঠান অথবা পার্টি সব সময় নিজের প্রভুত্ব বজায় রেখে চলতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। সবকিছুকে নিজ নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান। সমস্যা দেখা যায় সেখানেই, যখন কোনো শিল্পী তাঁদের হ্যাঁ-তে হ্যাঁ না মেলান। তখন সেই শিল্পীর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন নানান অভিযোগ এনে সেই শিল্পীকে এবং তাঁর শিল্পকে ব্রাত্য করা হয়। ব্রাত্য বসু এই সত্যকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন:

> "আমরা যতই কামু-কাফকা-সার্ত্র বা লেনিন-স্তালিন-মাও বা রবীন্দ্রনাথ আওড়াই আমাদের অধিকাংশই ভিতরে ভিতরে এক গোঁড়া অন্ধকূপের বাসিন্দা। দুর্ভাগ্যের কথা হল আমাদের এখানে কমিউনিস্ট নামধারী আদতে একটি আঞ্চলিক, ভোটসর্বস্ব, ক্ষমতালিপ্সু, সিন্ডিকেট করে দল চালানো ও আসলে যৌথতার নামে ব্যক্তির অহং দম্ভ ও মধ্যবিত্ত সুবিধাবাদকে কায়েম করতে চাওয়া কিছু মানুষ এই মনটাই পার্টিসর্বস্ব রাজনীতির নামে বয়ে নিয়ে এসেছেন বছরের পর বছর। তাঁদের আসলে কোনোদিন সাংস্কৃতিক নীতিই ছিল না কোনোকালে, তাঁরা কে যোগ্য কে অযোগ্য কোনোদিনই বোঝেননি, শুধু তাঁবেদার আর স্তাবকদের প্রশ্রয় দিয়েছেন, কিছু না কিছু পাইয়ে দিয়েছেন, প্রতিটি মাধ্যমে কী গানে কী কবিতায় কী থিয়েটারে চিরকাল মধ্যমেধাকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছেন। যে যত তাঁবেদার তাঁর তত নম্বর।"[১৪]

ঋত্বিক ঘটকের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ আনা হয়। কমিউনিস্ট পার্টির প্রিভিয়াস্সিয়াল কমেটির পক্ষ থেকে তাঁকে জিজ্ঞসাবাদের জন্য ডেকে পাঠানো হয়। তাঁর বিরুদ্ধে বলা হয়— তিনি পারিজাত বসুকে ব্যবসায় নামিয়ে আর্থিক

প্রতারণা করেছেন। এছাড়াও শৈলেন পেন্টারকে বাধ্য করা হয় ঋত্বিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে, বিরোধীপক্ষের থেকেও তাঁর বিরুদ্ধে বক্তব্য নোট নেওয়া হয়। ঋত্বিক ঘটক এসবের কারণ জানতে চাইলে নির্মল ঘোষ বলেন—

> "পার্টি মেম্বার যদি ব্যক্তিজীবনে কোনও গন্ডগোল করে থাকেন তবে প্রয়োজনে আমরা শ্রেণীশত্রুদের থেকেও জবানবন্দি নিতে পারি।"[১৫]

কোনো শিল্পী যদি নিজের সৃষ্টির দ্বারা, শিল্পের দ্বারা পপুলারিটি অর্জন করেন তা পার্টির ক্রিয়েটিভিটিহীন সদস্যের কাছে চক্ষুশূল হয়ে ওঠে। ঈর্ষাবশত জনপ্রিয় সেই শিল্পীকে নিচে নামানোর জন্য শিল্পীর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ আনা হয়:

> "যার যেটা প্রিয় কাজ সেটা করতে দেওয়া হবে না, তাঁর সম্পর্কে নীরব হয়ে যাওয়া, শিল্পীদের নিজস্ব ব্যক্তিগত পাগলামো ও ছেলেমানুষি ও খামখেয়ালিপনাকে শয়তানি ও বদমাইশি বলে লেবেল লাগানো ও ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া, অনুভূতিকে সম্পূর্ণ অসাড় করে দেওয়া, জীবনে একা করে দেওয়া, অনুগত ও বাধ্য না হলে উদ্ধত ও দুর্বিনীত বলে স্ট্যাম্প লাগিয়ে দেওয়া, প্রতিক্রিয়াশীল বলা... তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় ব্যক্তিগত কুৎসা যে অমুক চোর, তমুকে কামুক—ইত্যাদি ইত্যাদি।"[১৬]

এভাবে কালে কালে টার্গেট করে একে একে শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের ব্রাত্য করা হয়। উৎপল দত্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল, 'তিনি সি পি আই এর এজেন্ট'। সলিল চৌধুরীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল— 'গ্রামোফোন কোম্পানির ধর্মঘট ভাঙায় সলিলের হাত আছে।' ঋত্বিক ঘটক এ-সব প্রতিপ্রশ্ন তোলায় প্রমোদ দাশগুপ্তের মতো বাহুবলি নেতা তাঁকে বলেন 'ট্রটস্কির দালাল' (বেঁকিয়ে কথা বলা অর্থে), আবার সাবধানও করেন— 'আপনি মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন ঋত্বিক। ভদ্রভাবে কথা বলুন।' এ যেন পার্টির তর্জনিসংকেত মেনে চলার হুমকি। এ সম্পর্কে কবি জয় গোস্বামী যথার্থই বলেছেন:

> "এ হল ঈর্ষার আর এক রকম প্রকাশ অর্থাৎ আমি নেতা। তুমি কবি-সুরকার-গায়ক-পরিচালক যে-ই হও, তুমি আমাদের অধীনে থাকবে।"[১৭]

নিরঞ্জন সেন, নির্মল ঘোষ, প্রমোদ দাশগুপ্তরা হাই ক্রিয়েটিভ অবশ্যই মৌলিক শিল্পীর বিরুদ্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ করে, তাতে সাদা কালো কিছু মিশিয়ে মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করেন। দেবব্রত বিশ্বাস, ঋত্বিক ঘটক, সলিল চৌধুরী, সুভাস মুখোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীরা কমিউনিস্ট পার্টি এক সময় ত্যাগ করেন।

ক্ষমতাসীন পার্টি ক্ষমতার কোহলে উন্মত্ত হয়ে আরও ক্ষমতাশীল হয়ে ওঠবার প্রয়াস চালাতে থাকেন। একদিকে যেমন মৌলিক শিল্পী-সাহিত্যিকদের যেনতেন প্রকারে দল থেকে ব্রাত্য করেন, অন্যদিকে পার্টির প্রচার ও মতাদর্শ জনসম্মুখে তুলে ধরার জন্য একশ্রেণির অনুগত শিল্পীদের দলে টানেন। যাঁরা তাঁদের লেখায় পার্টির ইস্তেহার তুলে ধরবেন, বিনিময়ে তাঁরা পাবেন উচ্চ পদ, মোটা অনুদান। গিভ টেক অ্যাণ্ড পলিসি। তৈরি হয় 'আমরা-ওরা'র রাজনীতি। নাটকের মধ্যে প্রমোদ দাশগুপ্তের কথায় তা স্পষ্ট:

> "একটা সাদা পাতা নাও তো। মাঝখান থেকে মুড়ে দু'ভাঁজ কর। বাঁদিকে ওপরে লেখো আমরা, ডানদিকে ওরা। আমাদেরও তো কবি সাহিত্যিক আছে না কি? তবে? ওদের এবার একটু বলো-টলো। বুঝতে পেরেছ? তালিকাটা হোক— তারপর দেখছি। তবে একটা কথা তোমার ঠিক। আমিও ভাবছি। কী করে নিজেদের গণমাধ্যম তৈরি করা যেতে পারে। দেখা যাক।"[১৮]

লক্ষ করবার বিষয়, অনুগত শিল্পীদের দ্বারা তৈরি করা হবে গণমাধ্যম, একটা পপুলার মাস মিডিয়া। যেখানে অনুগত শিল্পীদের দ্বারা নিজেদের কথা তুলে ধরতে পারবেন। অধ্যাপক মলয় রক্ষিত তাঁর সংস্কৃতির অসুখ-বিসুখ গ্রন্থে 'আমরা-ওরা' রাজনীতির প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন:

> "শাসকের কুখ্যাত ঘোষণা— 'ওরা তিরিশ, আমরা দুশো পঁয়ত্রিশ'— এর থেকেই জন্ম নিল ভিন্নতর এক রাজনৈতিক ডিসকোর্স, যেখানে বাইনারি শুধু আমরা ওরা-য় নয়, বাইনারি দেখা দিল তথাকথিত শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধীজীবীদের মধ্যেও। বাম-শিল্পনীতির পক্ষে দাঁড়িয়ে সরকারকে সমর্থন করলেন সরকারপন্থী একদল বুদ্ধীজীবী। অন্যদিকে শাসকশিবির ছেড়ে বেরিয়ে এলেন অনেকেই যাঁরা সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম গণ-আন্দোলনের সামনের সারিতে দাঁড়ালেন।"[১৯]

যে সব শিল্পীরা দলের আনুগত্য মেনে চলতেন না তাঁদের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র ভিত্তিহীন অভিযোগ, ব্রাত্য করা হত তাই-ই নয়, কীভাবে যন্ত্রণাবিদ্ধ করা যায় তারও প্ল্যান করা হত। প্রমোদ দাশগুপ্ত যখন বলেন:

> "হ্যাঁ মেয়ারহোল্ড[২০]। ওকে স্তালিন যা করেছিলেন বা ওর বউকে— চোখ উপড়ে নেওয়া হয়েছিল না? গুলি করে মারাই ঠিক। আর যাই হোক পৃথিবী থেকে অন্তত কিছু আবর্জনা কমত।"[২১]

প্রতিষ্ঠানের প্রবল নিয়ন্ত্রণ সংস্কৃতি জগতের সর্বস্তরেই কায়েম ছিল। কী নাটক, কী কবিতা, কী সংগীতের ধারা— স্বতন্ত্র শিল্পী মাত্রই এক সংকটের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। প্রতিষ্ঠানের কালাকানুন, প্রতিষ্ঠান কমেটির রিপোর্ট ছিল বিধিলিপির মতো। কোনো শিল্পী সেই বিধিলিপি মেনে না চললে তিনি অপর। তাঁর শিল্প-ও অপাংক্তেয়। ইতিহাসের বুকে সাক্ষ্য রেখে যাওয়া এমন এক নিঃসঙ্গ শিল্পী হলেন দেবব্রত বিশ্বাস। শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় নাটকটি সম্পর্কে বলেন:

> "নাটকটিতে প্রতিষ্ঠান বা 'এস্টাব্লিশমেন্ট' এর সঙ্গে শিল্পী ও তার সৃজনের একটি মৌলিক ও স্থায়ী বিরোধকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।"[২২]

দেবব্রত বিশ্বাস প্রতিষ্ঠানের মধ্যে না ভিড়িয়ে গড়ে তুলতে পেরেছিলেন জনপ্রিয় এক পাবলিক প্ল্যাটফর্ম। তিনি নিজেই একটা প্রতিষ্ঠান, তাঁর কোনো প্রতিষ্ঠানের দরকার পড়ে না। এ প্রসঙ্গে ব্রাত্য বসু যথার্থই বলেছেন:

> "দেবব্রতর জীবনবৃতান্তে খুব ভাল করে অবগাহন করলে দেখা যায়, যেহেতু তিনি ক্ষমতাবৃত্তের বাইরের লোক হিসেবেই থেকে গেলেন, ক্ষমতার চর্চা নিয়ে মস্তিস্কটি ঘামার্ত করলেন না, ফলে একেবারেই নিজস্ব গঠনরীতি এবং নিটোল একটি নিঃসঙ্গতা সম্বল করে থেকে গেলেন অনেকটাই কর্ণের মতই।"[২৩]

এখানেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর বিরোধ। সারাজীবন যিনি রবীদ্রসংগীত চর্চায় ব্যয় করেছিলেন, এমন এক মহারথির দুটি গানকে বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড অনুমোদন দেননি—

> মাননীয় শ্রী দেবব্রত বিশ্বাসের দুটি গান আমরা মনোনীত করতে পারছি না। প্রথমটি হল 'এসেছিলে তবু আসো নাই'— এটিকে নতুন করে রেকর্ড করতে হবে কারণ বারবার বলা সত্ত্বেও এতে যথেচ্ছ যন্ত্রসংগীত ব্যবহার করা হয়েছে যার জন্য এটি একদিকে যেমন কানে প্রবল ধাক্কা দিচ্ছে, তেমনি রবীন্দ্রসংগীতের পক্ষেও অত্যন্ত ক্ষতিকর হইয়ে উঠছে। দ্বিতীয়টি হল 'মেঘ বলেছে যাব যাব'— এটিতে কুৎসিতরকমের মেলোড্রামাটিক গলা ব্যবহার করা হয়েছে। যন্ত্র সংগীতের ব্যবহারও প্রথমটির অনুরূপ।[২৪]

বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড থেকে দেবব্রত বিশ্বাসকে এই চিঠি লেখা হয় ১৯৬৪ সালে। তখন কেন্দ্র ও রাজ্য কংগ্রেসের শাসনে। তারপর ১৯৬৯-তে তাঁর দুটি গান আবার বিশ্বভারতী অনুমোদন দেননি। ১৯৭১-তে তাঁর কিছু গান অনুমোদন পায়নি।

বিশ্বভারতীর মিউজিক বোর্ডের দেওয়া চিঠিটির শব্দবন্ধের দিকে তাকানো যাক। প্রথম গানটি মনোনীত করতে না পারার কারণ, 'বারবার বলা সত্ত্বেও' সেটিতে নাকি 'যথেচ্ছ যন্ত্রসংগীত' ব্যবহার করা হয়েছে। এ সম্পর্কে যে আরো কয়েকবার জানানো হয়েছিল, শিল্পী যে সেটা শুনেননি সেটা জানানোর মধ্যে ঔদ্ধত্য লক্ষ করবার মতো। একজন শিল্পী সংগীতে কেমন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করবেন তা প্রতিষ্ঠানের বুলেটিন কমিটি মেপে দেবেন। বুলেটিন কমিটির নির্দেশ অমান্য করলে তা অনুমোদন করা হবে না। বুলেটিন কমিটির নির্দেশ অমান্য করে যথেচ্ছ যন্ত্রসংগীত ব্যবহারের ফলাফল কী হতে পারে? তা নাকি 'কানে প্রবল ধাক্কা দিচ্ছে' এবং রবীন্দ্রসংগীতের পক্ষেও 'অত্যন্ত ক্ষতিকর'। অর্থাৎ শুধু ধাক্কা নয়, 'প্রবল ধাক্কা', ক্ষতিকর নয়। তার থেকেও বেশি 'অত্যন্ত ক্ষতিকর'। আর দ্বিতীয় গান 'মেঘ বলেছে যাব যাব'— গানটিতে নাকি 'কুৎসিত মেলোড্রামাটিক গলা ব্যবহার করা হয়েছে'। ক্ষোভের, আক্রমণের ধরনটা লক্ষ করবার মতো। গানটি মেলাড্রামাটিক নয়, গলাটি মেলোড্রামাট্রিক, তাও নয়, কুৎসিত মেলোড্রামাটিক। একজন যথার্থ আর্টিস্টকে কতটা নিকৃষ্টভাবে আক্রমণ করা যেতে পারে সুপরিকল্পিত ভাষা ব্যবহারের এমন দৃষ্টান্ত সত্যিই বিরল। দেবব্রত বিশ্বাসের মত একজন 'অরিজিন্যাল' শিল্পীর ক্ষেত্রে বিশ্বভারতীর মিউজিক বোর্ডের সুপারিশ মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। দেবব্রত বিশ্বাস বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডে গিয়ে জানতে পারেন, বুলেটিন কমিটি ক্ষমতার আজ্ঞাবহ— 'আমরা মশাই হুকুমের আজ্ঞাবহ'। ক্ষমতাসীন পার্টির হুকুমই হচ্ছে বুলেটিন কমিটির রিপোর্ট। দেবব্রত বিশ্বাস

বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। তাঁদের জন্য সংগীত রেকর্ড করা বন্ধ করে দিলেও, সংগীতকে তিনি ছাড়েননি। রামকৃষ্ণ শিশুমঙ্গল হাসপাতালের বেডে শুয়েও সুচিত্রা মিত্রকে শুনিয়ে দেন তাঁর পরিকল্পনার কথা—

> "হইতে পারে আমি এখন অসুস্থ। হইতে পারে আমি এখন গান রেকর্ডিং করতাছি না, পাবলিকলি অ্যাপিয়ারও তেমন কইর‍্যা করি না কিন্তু গান গাওয়া আমার বন্ধ হইব না। দরকার পড়লি গোটা পশ্চিমবঙ্গ ঘুইর‍্যা ফাংশনে গাইব। সেইহানে আমি মিউজিক বোর্ডের নাগালের বাইরে।"[২৫]

একজন প্রকৃত শিল্পীকে প্রতিষ্ঠান কখনই তার চৌহদ্দির মধ্যে আটকে রাখতে পারেন না। এ প্রসঙ্গে শম্পা ভট্টাচার্যের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য:

> "রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মকানুনের বেড়াজালে বন্দি রবীন্দ্র সংগীতকে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন দেবব্রত বিশ্বাস। প্রতিষ্ঠানের কাছে তিনি ছিলেন 'হরিজনের' নামান্তর।"[২৬]

'রুদ্ধসংগীত' নাটকে তৃতীয় স্তরে দেখা যায়, গণমাধ্যম এবং শিল্পীর সংগ্রামের লড়াই। কবি জয় গোস্বামীর মতে:

> "এই নাটক কেবল রাজনৈতিক নাটক নয়। এই নাটক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একক চিরকালীন সংগ্রাম-সম্পর্ককে ধারণ করে আছে।"[২৭]

আনন্দবাজার পত্রিকার সন্তোষকুমার ঘোষ পুরস্কার-অনুষ্ঠানে গান গাইবার জন্য দেবব্রত বিশ্বাসকে বলেন। তিনি আরও বলেন, বছরে দুটি করে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিল্প-সাহিত্য-প্রবন্ধের অঙ্গনে সর্বোৎকৃষ্ট দুটিকে বেঁছে নেওয়া হয়। বিজয়ীকে টাকা দেওয়া হয়। দেবব্রত বিশ্বাস বলেন—

> "হ, এটা তো তাহলি বানিজ্যিক ব্যাপার। তা আমারে কত দিবেন। গান গাইবার জন্যি?"[২৮]

সন্তোষ কুমার ভেবেছিলেন, দেবব্রত তাঁদের প্রতিষ্ঠানে গান গাইবেন, সংগীত শিল্পীর আবার মূল্য কী। তাছাড়া তাঁদের প্রতিষ্ঠানে গান করবেন এতেই তো তার নাম সম্প্রচারিত হবে। দেবব্রত বিশ্বাসের রাজি না হওয়া সন্তোষ কুমার মেনে নিতে পারেননি। তিনি পরিকল্পনা করেন, তাঁদের সংবাদ মাধ্যমে দেবব্রত বিশ্বাসের নামে মিথ্যা প্রচার করবেন। দেবব্রত বিশ্বাসের নামে সুর ও স্বর বিকৃত করার যে অভিযোগ আছে তা আরো রঙ মাখিয়ে প্রচার করবেন। যদিও তিনি দেবব্রত বিশ্বাসের গানের একজন ভক্ত, তবুও দেবব্রত বিশ্বাস যেহেতু তাঁর প্রতিষ্ঠানকে অপমান করেছেন, তা তিনি কোনোভাবেই সহ্য করতে পারবেন না। শোভন গুপ্তের মতে:

> "একদিকে ক্ষমতা ধীরে ধীরে এক জাল ছড়াচ্ছে, অন্যদিকে একজন মানুষ, দেবব্রত বিশ্বাস এগিয়ে যাচ্ছেন তাঁর মার্জিনালিটির সাধনার পথে। সবরকম ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠান এসে তাঁর গানের ডানা ছেঁটে দিতে চাইছে। রবীন্দ্র গান গাওয়া তাঁর কাছে তো গায়ক হইয়ে ওঠবার জন্য নয়, এমন এক সাধনা যা সমস্ত মুরুব্বিয়ানার বিরুদ্ধে তর্জনিসংকেত করে।"[২৯]

যাই হোক, 'রুদ্ধসংগীত' নাটকে প্রত্যক্ষভাবে উঠে এসেছে রাজনীতি, সময়, শাসকদলের স্বরূপ এবং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শিল্পীর লড়াই।

**তথ্যসূত্র:**

১. বসু, ব্রাত্য। গদ্যসংগ্রহ। দে'জ পাবলিশিং হাউস, ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ১৯৩।
২. গোস্বামী, জয়। ব্রাত্য: বহুমুখী প্রতিভাবিদ্যুৎ। কারিগর, ২০২২, কলকাতা, পৃ. ৩৮।
৩. বসু, ব্রাত্য। গদ্যসংগ্রহ। দে'জ পাবলিশিং হাউস, ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ৩৯৫।
৪. বসু, ব্রাত্য। কথাবার্তা সংগ্রহ। দীপ প্রকাশন, ২০২৫, কলকাতা, পৃ. ৮৮২।
৫. বসু, ব্রাত্য। গদ্যসংগ্রহ। দে'জ পাবলিশিং হাউস, ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ২০১।
৬. গোস্বামী, জয়। ব্রাত্য: বহুমুখী প্রতিভাবিদ্যুৎ। কারিগর, ২০২২, কলকাতা, পৃ. ৮১-১১৩।
৭. বসু, ব্রাত্য। বাহিরের এই ভিক্ষা ভরা থালি। কারিগর, ২০২২, কলকাতা, পৃ. ২৪৯।
৮. বসু, ব্রাত্য। নাটক সমগ্র। দ্বিতীয় খণ্ড। আনন্দ, ২০১৪, কলকাতা, পৃ. ৩০২।
৯. তদেব, পৃ. ৩১৫।
১০. তদেব, পৃ. ৩০২।

১১. তদেব, পৃ. ৩০৮।
১২. বসু, ব্রাত্য। বাহিরের এই ভিক্ষা ভরা থালি। কারিগর, ২০২২, কলকাতা, পৃ. ১৯৬।
১৩. বসু, ব্রাত্য। গদ্যসংগ্রহ। দে'জ পাবলিশিং হাউস, ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ৩৯৬।
১৪. তদেব,পৃ. ৩৯৫।
১৫. বসু, ব্রাত্য। নাটক সমগ্র। দ্বিতীয় খণ্ড। আনন্দ, ২০১৪, কলকাতা, পৃ. ৩১২।
১৬. বসু, ব্রাত্য। গদ্যসংগ্রহ। দে'জ পাবলিশিং হাউস, ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ৩৯৫-৩৯৬।
১৭. গোস্বামী, জয়। ব্রাত্য: বহুমুখী প্রতিভাবিদ্যুৎ। কারিগর, ২০২২, কলকাতা, পৃ. ৪০।
১৮. বসু, ব্রাত্য। নাটক সমগ্র। দ্বিতীয় খণ্ড। আনন্দ, ২০১৪, কলকাতা, পৃ. ৩১৫।
১৯. রক্ষিত, মলয়। সংস্কৃতির অসুখ- বিসুখ। কারিগর, ২০২৫, কলকাতা, পৃ. ৭৮।
২০. গোস্বামী, জয়। ব্রাত্য: বহুমুখী প্রতিভাবিদ্যুৎ। কারিগর, ২০২২, কলকাতা, পৃ. ৮৯।
২১. বসু, ব্রাত্য। নাটক সমগ্র। দ্বিতীয় খণ্ড। আনন্দ, ২০১৪, কলকাতা, পৃ. ৩১৪।
২২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তনু। অস্তিত্ব অনুভূতি অবিনির্মাণ: ব্রাত্য বসুর নাটক। দীপ প্রকাশন, ২০১৭, কলকাতা, পৃ. ১২৫।
২৩. বসু, ব্রাত্য। বাহিরের এই ভিক্ষা ভরা থালি। কারিগর, ২০২২, কলকাতা, পৃ. ২৪৮।
২৪. বসু, ব্রাত্য। নাটকসমগ্র। দ্বিতীয় খণ্ড। আনন্দ, ২০১৪, কলকাতা, পৃ. ৩২০।
২৫. তদেব, পৃ. ৩১৯।
২৬. ভট্টাচার্য, শম্পা। ব্রাত্য বসুর নাটক থেকে নাট্যে। দীপ প্রকাশন, ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ৭৬।
২৭. গোস্বামী, জয়। ব্রাত্য: বহুমুখী প্রতিভাবিদ্যুৎ। কারিগর, ২০২২, কলকাতা, পৃ. ৪২।
২৮. বসু, ব্রাত্য। নাটক সমগ্র। দ্বিতীয় খণ্ড। আনন্দ, ২০১৪, কলকাতা, পৃ. ৩৩১।
২৯. গুপ্ত, শোভন। ব্রাত্য। দীপ প্রকাশন, ২০১৩, কলকাতা, পৃ. ২৫০।

**গ্রন্থপঞ্জি:**

১. গুপ্ত, শোভন। ব্রাত্য। দীপ প্রকাশন, ২০১৩, কলকাতা।
২. গোস্বামী, জয়। ব্রাত্য: বহুমুখী প্রতিভাবিদ্যুৎ। কারিগর, ২০২২, কলকাতা।
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তনু। অস্তিত্ব অনুভূতি অবিনির্মাণ: ব্রাত্য বসুর নাটক। দীপ প্রকাশন, ২০১৭, কলকাতা।
৪. বসু, ব্রাত্য। কথাবার্তা সংগ্রহ। দীপ প্রকাশন, ২০২৫, কলকাতা।
৫. বসু, ব্রাত্য। গদ্যসংগ্রহ। দে'জ পাবলিশিং হাউস, ২০১৯, কলকাতা।
৬. বসু, ব্রাত্য। নাটকসমগ্র। দ্বিতীয় খণ্ড। আনন্দ, ২০১৪, কলকাতা।
৭. বসু, ব্রাত্য। বাহিরের এই ভিক্ষা ভরা থালি। কারিগর, ২০২২, কলকাতা।